রঙ পবনের নাও

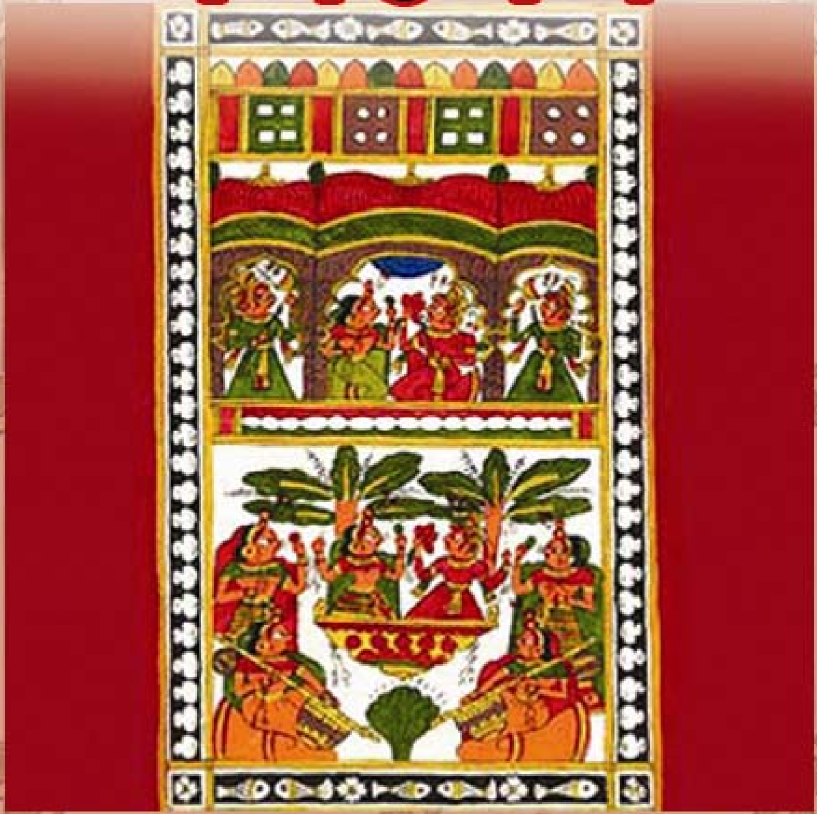

একটি সচলায়তন প্রকাশনা
২০০৯

রঙ পবনের নাও

সচলায়তন ফটোব্লগ সঙ্কলন

(সচলদের তোলা ছবি ও লেখা নিয়ে ই-বই)

২০০৯

প্রকাশক

সচলায়তন.কম

প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৪১৬

সমন্বয়ক

নজরুল ইসলাম

প্রতিটি ছবি ও লেখার স্বত্ব লেখকের

লেখক তালিকা

(বাংলা বর্ণক্রম অনুসারে)

অতন্দ্র প্রহরী

অবসরবিহীন

অম্লান অভি

অরূপ

ইমরুল কায়েস

ইশতিয়াক রউফ

এনকিদু

জুলফিকার কবিরাজ

তানবীরা

তুলিরেখা

দময়ন্তী

নজরুল ইসলাম

প্রকৃতি প্রেমিক

বিপ্লব রহমান

মাশীদ

মৃদুল আহমেদ

মৃন্ময় আহমেদ

মুস্তাফিজ

মূলত পাঠক

রণদীপম বসু

লীনা ফেরদৌস

সচল জাহিদ

ভূমিকা

প্রথমেই সবাইকে বাংলা নতুন বছরের শুভেচ্ছা
এই আনন্দের দিনে একটা ই-বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয় সচলায়তন
বিষয় নির্ধারিত হয় জীবনের আনন্দ, রঙ আর ফুর্তি
যে যেভাবে আনন্দ খুঁজে নেয় জীবন থেকে, তারই প্রকাশ
অনেক সচল এবং অতিথি সচল ছবি আর লেখা জমা দেন
কারিগরী কিছু সমস্যার কারনে সবার ছবি আর লেখা প্রকাশ করা গেলো না
খুব দুঃখিত

এই পুরো কাজে সবাই এতো আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন
তাদের নাম আলাদা করে বলে খাটো নাই করলাম নাহয়
তবে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা

নির্ভুলতার দাবী করছি না
স্বীকার করছি অনেক ভুল রয়ে গেছে
ক্ষমা করার দায় আপনাদের

আর লেখক, পাঠক, সমালোচক- ধন্যবাদ সবাইকে

নজরুল ইসলাম
সমন্বয়ক

০৪

হারিয়ে যাওয়া শৈশবের কথা ভেবে কী সহজেই না আমরা স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ি। অথচ বড্ড অদ্ভুত এক সত্য হলো- শৈশবের নির্দিষ্ট কোন বয়সকাল নেই, এবং শৈশব কখনো হারায় না। প্রবল বিশ্বাসবোধই কেবল সেই সময়গুলোতে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, যে কোন বয়সে, চোখের পলকে

অতন্দ্র প্রহরী

মেলা, দেশে বিদেশে

অবসরবিহীন

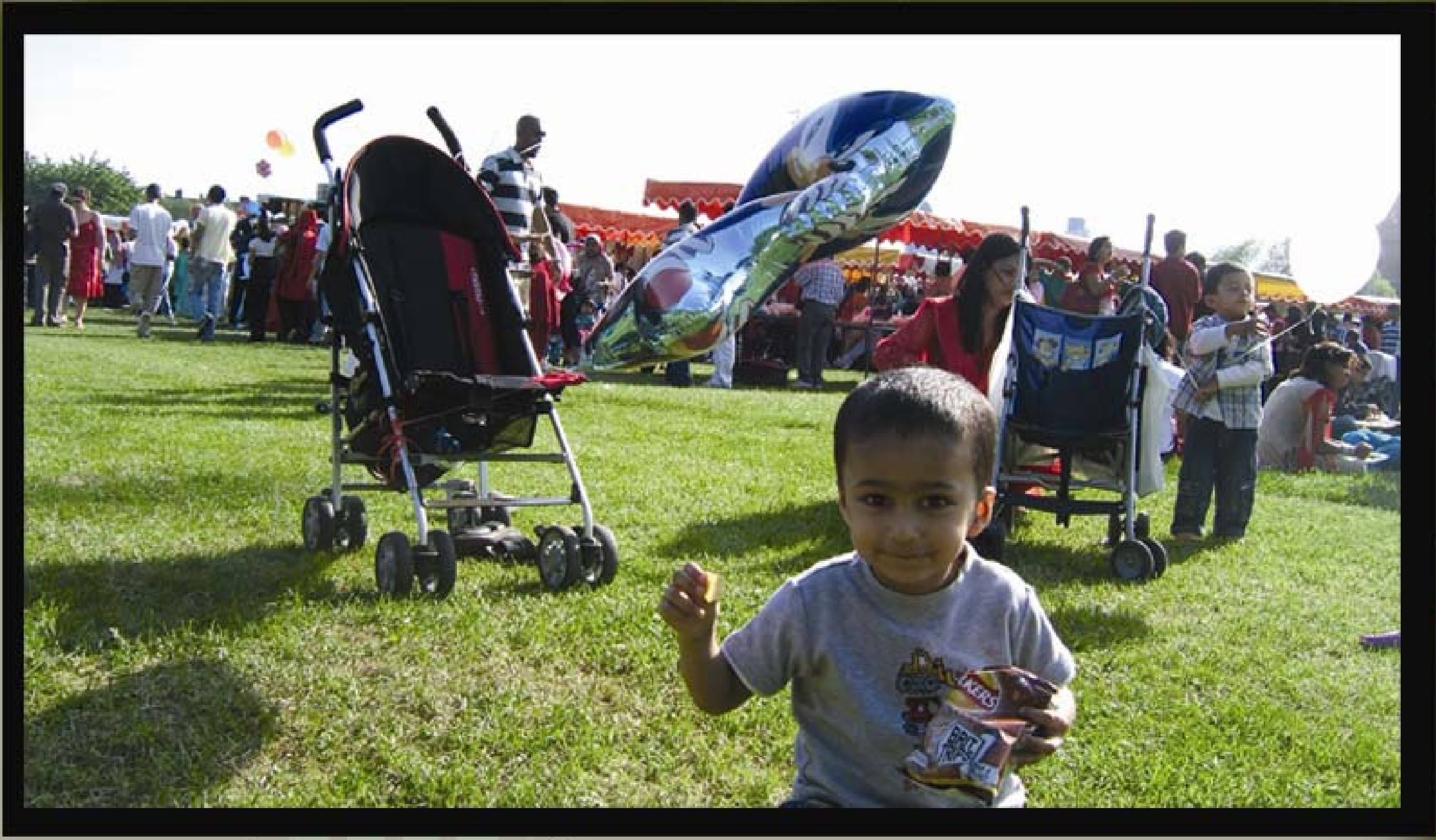

আমি তখন সম্ভবত নয় কিংবা দশ। মেজ মামার শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। মামীর সাথে শুধু আমি আর ছোট মামাতো ভাই, শোয়েব। মামীর গ্রামের বাড়ি হবিগঞ্জ (তৎকালীন সিলেট) জেলার চুনারুঘাট গ্রামে। বড় রাস্তার পাশেই খুব সুন্দর একটা বাড়ি। সামনে একটা পুকুর, গোয়াল ঘর, গাছপালায় ছায়াঘেরা মনোরম পরিবেশ সকাল হতে না হতেই শায়েস্তা মামা (মামীর বড় ভাই) আমাদেরকে নিয়ে গেলেন তাদের বাড়ি থেকে সামান্য হেঁটে নতুন পুকুরটির খনন কাজ দেখার জন্য। প্রথম দেখলাম কিভাবে ঘনক আকৃতিতে পীট (peat) কেটে মাটির নিচে কত সহজেই পানির স্তর পাওয়া যায়। পুকুর কাটার স্থানের অদূরেই দেখলাম অনেকগুলো ছোট ছোট সাময়িক দোকান বসেছে। সেখানে রং বেরঙ-এর কি সব জিনিসপত্র, খেলনা, বেলুন, খাবার আরও কত কি চোখে পড়ছে। তখনও জানতাম না এটি বৈশাখী টেমলার স্থানীয় আয়োজন। মামা আমাদের মেলায় নিয়ে গেলেন। অনেক কিছুই এখন আর মনে নেই, তবে খুব মজা পেয়েছিলাম আর আমাকে ও শোয়েবকে খেলনা কিনে দিয়েছিলেন সেটা মনে আছে। সেই মিঠে মিঠে রোদ, লোক সমাগম, ছোট ছোট বাচ্চাদের আনন্দ, কোলাহল, কানে বাজে, এখনো চোখে ভাসে। আমার ছেলেবেলায় দেশের মাটিতে ওটা ছিলো প্রথম ও শেষ বৈশাখী মেলা। গত বছর প্রথমবার আমার ছেলেকে নিয়ে লন্ডন-এ বৈশাখী মেলায় যাই। এখানে বৈশাখী মেলার বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশ অন্য রকম। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরের বাঙ্গালিসহ নানান দেশের প্রচুর অবাঙ্গালি নাগরিক এই মেলার আনন্দে অংশগ্রহন করে। হরেক রকম দোকানে থাকে নানান রকম খাবার আর কেনাকাটার জিনিসপত্র। বাংলেদেশ থেকে আনা হয় বিভিন্ন শিল্পীদের। বিলেতের স্থানীয় শিল্পীরাও অংশ নেন। মেলার অনুষ্ঠানটি দূরদর্শনের পর্দায় সরাসরি সম্প্রচার হয়। আমার মত আমার ছেলের তার প্রথম বৈশাখী মেলায় যাবার কথা মনে নাও থাকতে পারে। তবে পুরনো আলোকচিত্র দেখলে হয়তো দোলা লাগতে পারে স্মৃতির গহীন পাতায়।

হাজরা খেলার আনন্দে রঙিন হবে চৈত্র সংক্রান্তি প্রথম সকাল

অম্লান অভি

'আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর...' সেই সত্য সুন্দরকে কি ধারণ করা যায় ক্যামেরায়? যে আনন্দ মন্থন করেছি দ্রুতগামী পাতাল রেলে চড়ে, দ্রুতযান ট্রেন ধরতে ভোরের আযানের শব্দ সাথে করে বাবার পিছন পিছন যেতে যেতে তাঁর চোখ আড়াল করে কুড়োনো হবিবর কাকুর বাড়ির পড়ে থাকা কুল, সেই আনন্দ তো তুলে রাখতে পারিনি আমার ছোট বেলায়। যে রঙিন স্বপ্নে বিভোর থাকি রাত-ভোর তার ছবি কি তোলা যায়! এত অবান্তর প্রশ্নে প্রশ্নে দিন কাটাতে কাটাতে আনন্দের ছবি পাঠানোর শেষ ক্ষণ কড়া নাড়ে আমার মনের কোণে।

এরই মধ্যে একদিন হবিগঞ্জের ইনায়েতাবাদ দরগা মাজারের ওয়াজ মাহফিলে গিয়েছিলাম। মাজার দেখা আর মনের গভীরে আনন্দের ছবি তোলার শখ, হায় ফিরে এলাম আনন্দহীন ছবি নিয়ে। নদী ভ্রমণে গেলাম কিন্তু সবই সেই রূপহীন লঞ্চ আর পালহীন ইঞ্জিন নৌকা... জল তার রূপ হারিয়েছে আমাদের পয়ঃনিস্কাশনের কারণে। রূপালী ইলিশের মৌসুম নয় তবে রুপালী জাটকাও চোখে পড়ল না ছবি তোলার জন্য, তুলে রাখতে পারিনি নিমতলার মৈত্রির বৈশাখীর প্রথম প্রহরের আগমনী উল্লাসের প্রভাত আয়োজনের ছবি যা মনকে নাড়ে। দিন বদলের অনেক ছবিই তোলার চেষ্টা করলাম ই-বইকে মনে করে, কিন্তু আনন্দহীন আনন্দ খোঁজার নিরলস কর্ম কর্মহীনই রয়ে গেল।

চৈত্র শেষে পাবনায় একরকম ধর্মীয় আচার প্রচলিত- 'হাজরা খেলা'। প্রতিটি পাড়া তাদের দল নিয়ে ভোর থেকে মন্দিরে মন্দিরে হাজির হয় নানা রঙে সেজে। চৈত্র সংক্রান্তিতে। ঢাক ঢোলের সাথে সাথে এক এক দল তাদের প্রদর্শন করে যায় নির্দিষ্ট মন্দিরে। কিন্তু সেই সংক্রান্তি তো আর পাবো না এখন। তবে যারা সেই দিন বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হবে তারা চৈত্র সংক্রান্তির সাত দিন আগ থেকে বাড়ীতে বাড়ীতে যায় তাদের পাট (একটা কাষ্ঠ খণ্ড যাতে তেল সিন্দুর দেয়া থাকে। বছর জুড়ে পুকুরে অথবা মন্দিরে রাখা থাকে সেটা) নিয়ে । এবার পাট নিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে বাদ্যযন্ত্রের সাথে তারা শিব দূর্গার গাঁথা গাইতে থাকে আর শেষে তাদের সেই কাঙ্খিত দিনের জন্য অর্ঘ্য আদায় করে চাল, ডাল, ফল, তেল, কিছু কাঞ্চনও পায় ডালায়।

সেই ছবি তোলার জন্য মাস পরে পাবনায় এসে এক শুক্রবারে দিনভর রয়ে গেলাম বাড়ীতে, কখন কোন দল আসে, কিন্তু ভাগ্যদেবী যাদের পাঠাল তাদের ছবিতে যে আনন্দ তা কি সর্বজনীন হবে? এ ভেবে ভেবে একের পর এক সাটার টিপলাম। শেষ বিকেলে উত্তর চক থেকে এল একটু রঙিন আর একটু সজ্জিত দলটি, ছবি তুললাম। ছবির আনন্দ সেই সব উপস্থিতদের মাঝে যেভাবে ছিল তা কি আসলে তোলা গেল পাঠানোর এই আসরে পিক্‌জেল ক্যালকুলেশন করে!

ক্যারিফিয়েস্তার ফুল

অরূপ

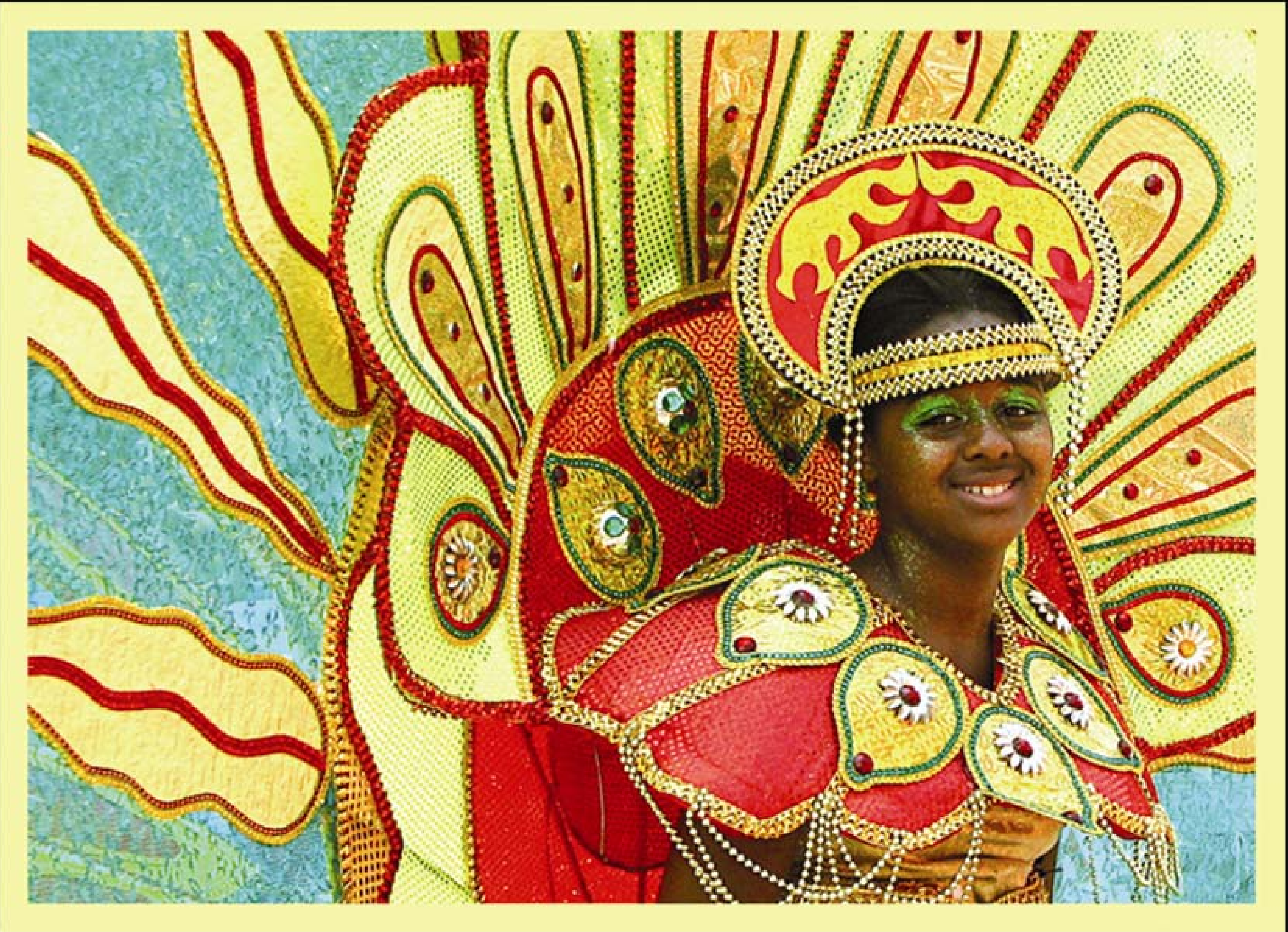

কাজের প্রয়োজনে বেশ কিছুদিন মন্ট্রিয়লে ছিলাম। একে তো সামার, তার উপরে থাকি ডাউনটাউনের সবচে' সরগরম জায়গাটায়। কোনমতে পাঁচটা দিন পার করতে পারলেই উইকএন্ড, আর উইকএন্ড মানেই হেঁটেহেঁটে শহরটার সাথে আড্ডা দেওয়া। এক উইকএন্ডে হাঁটতে হাঁটতে চেনা সেন্ট ক্যাথরিন স্ট্রিট ছেড়ে চলে গেলাম বুলভা ড্রেনে-লেভস্কে। বুলভা ড্রেনে-লেভস্ক হল বড় রাস্তা। বড় রাস্তায় গিয়েই অবাক, গাড়ি নাই, ঘোড়া নাই, শুধু দূরে বাজছে ক্যালিপসো ঢাকঢোল! শব্দ শুনে সামনে যেতেই পরিস্কার হল ঘটনা, প্যারেড চলছে, ক্যারিবিয়ানদের প্যারেড, যাবে এই বুলভা ধরেই। নানা রঙে আর সজ্জায় সেজেছে সবাই। কেউ পাখি, কেউ ফুল, কেউ নাচে, কেউবা গায়। সুদীর্ঘ সেই শোভাযাত্রা যাকে স্থানীয়রা বলে ক্যারিফিয়েস্তা প্যারেড। শোভাযাত্রার শেষভাগে ছিল এই কিশোরী, ফুল সেজেছিল সে। মাঝবেলার তাতানো রোদে তাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কিন্তু সে আজ ক্যারিফিয়েস্তার ফুল, তাকে কি ক্লান্ত হলে চলে। পানির বোতলটা একটু মুখে ছুঁইয়েই সমস্ত উদ্যম নিয়ে সে এগুতে থাকে আবার। আমি ছবি তুলি, ফুলকুমারী হাত নেড়ে হাসে..

হোটেলে ফিরতে ফিরতে মনটা বিষন্ন হয়ে পড়ে, শেষ কবে পয়লা বৈশাখে গিয়েছিলাম তা আর মনে পড়েনা... সময় আমাদের কতো কিছুই না ভুলিয়ে দেয়..

খিলধরা হাসি কী ও কেন?

ইমরুল কায়েস

একদা বুয়েটের কোনো এক বিভাগের কোন এক ব্যাচের শেষ টার্মের ছাত্রছাত্রীরা তাদের দীর্ঘ, বিরক্তিকর এবং বাঁশমূলক পড়াশুনা একদিনের জন্য বন্ধ রাখার মনস্থ করল, ঠিক করলো পিকনিকে যাবে। ঐ ব্যাচে না আঁতেল, না বাঁতেল এমন একজন অর্বাচীন ছিল, ইমরুল কায়েস তার নাম। কেউ তাকে কোন দায়িত্ব না দিলেও সে নিজের বিবেচনায় পিকনিকের সব দায়িত্ব নিল। যদিও আমরা সকলেই তাকে ভয় দেখিয়ে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে আমাদের সকলকে আশ্বস্থ করল যে, "হবে হবে" । আমরা কি "হবে" সেটা দেখার অপেক্ষা করতে লাগলাম। সে ঠিক করল দড়ি টানাটানি খেলা হবে। এই উদ্দেশ্যে সে এক বিকেলে নিউমার্কেট বা পলাশী বাজারে গেল দড়ি কিনতে। তাকে দেখেই দোকানদার বোধহয় বুঝেছিল যে, মক্কেল হিসেবে সে একটা ভুদাই। দোকানদার তাকে বোধহয় একটা দড়ি এনে দিয়েছিল বলে আমরা ধারনা করি এবং দু'জন লোক দিয়ে দড়িটা দু'পাশে টানিয়ে হয়ত দোকানদার দেখিয়েছিল যে দড়িটা ঠিক আছে। অতপর ইমরুল কায়েস বোধহয় ছাত্রছাত্রীদের পিকনিকের চাঁদায় গোডাউনের পোকায় কাটা দড়ি কিনে ফেরত এসেছিল। পিকনিকের দিন দুই সেকশনের জনা পনোরো করে দামড়া লোকজন দড়ির দুইপার্শ্বে দাঁড়ায় দড়ি টানাটানি খেলবে বলে। ইমরুল কায়েস গলায় ঝুলানো বাঁশি ফুঁকিয়ে এদের খেলা শুরু করতে বলে এবং অন্যের থেকে নেয়া মোবাইল ক্যামেরা অথবা ডিজিটাল ক্যামেরা বা এরকম কোন যন্ত্র আমরা ঠিক জানি না বা আমাদের মনে নেই, নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ছবি তুলবে বলে এবং ছবি যে তোলা হয় সেটা আমরা বুঝতে পারি। এরপর হতে পারে কোন পরাবাস্তবতা ভর করে সেই দামড়াদের উপর। তারা প্রবলভাবে দড়ি টানাটানি করে কয়েক সেকেন্ডেই দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে। প্রথমে আমরা দড়ির এই অকালপ্রয়াণে খানিকটা অবাক হই কিন্তু পরমুহূর্তেই হাসতে থাকি, হাসতে থাকি ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আমাদের পেটে খিল ধরে এবং আমরা সবাই নিশ্চিত হই যে, আমরা এই পিকনিকে একটা বিশেষ জিনিস দেখেছি যা আর সারা জীবনে দেখিনি, এতগুলো মানুষ পেটে খিল লাগিয়ে একসাথে বিরামহীন হাসছে এটা আমরা কখনও দেখিনি। তখন আমরা ইমরুল কায়েসকে খুঁজতে থাকি কারন আমরা জানি যে, সেই দড়িটা কিনেছে এবং ইমরুল কায়েসকে অনেক দূরে প্রায় দৃষ্টিসীমার বাহিরে বসা অবস্থায় আবিষ্কার করি । হয়ত সে এই ঘটনা দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল লাগিয়েছে ও বসে পড়েছে অথবা পোকায় কাটা দড়ি কেনার অপবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মুখ লুকিয়ে আছে, এই দুটোর ঠিক কোনটা আমরা তখন বুঝতে পারি না।

আমি ঈশান বিষাণে ওঙ্কার

ইশতিয়াক রউফ

বাবুটার জন্মদিন।
স্বপ্ন আর পরিকল্পনা নিয়ে নির্ঘুম রাত জেগে পালা করে দোল দেওয়ার দিনগুলো শেষ হলেও আচমকা জ্বরে ঘাবড়ে গিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দুঃস্মৃতি এখনও দগদগে বাবা-মায়ের মনে।
হামা দিতে দিতে হাঁটা শুরু করে দিয়েছে কোন অজান্তে। ঘর জুড়ে বেড়া আর তালা দিয়েও আটকে রাখা যায় না। কীভাবে যেন ফ্রিজের ভেতর ঢুকে পড়ে, টিভির তার খুলে ফেলে, ঈগলের মত ছোঁ মেরে ল্যাপটপের কি-বোর্ড তুলে ফেলে। প্রতিটি অপকর্মের পরই পরম আনন্দের এক হাসি।
সে-হাসি দেখে বকা যায় আর?
এভাবেই চলে আসে আরও একটি জন্মদিন।
ঈশানের জন্মদিন। এবার আর সদ্য-ডিগ্রিপ্রাপ্ত বাবা-মায়ের সনদের উপর শুয়ে ছবি তোলার বয়স নেই। নেই সেই স্থিরতাও।
দুরন্তপনার এক ফাঁকে ছোট্ট ঈশান হঠাৎ করেই এসে দাঁড়ায় তার জন্মদিনে তৈরি করা বোর্ডগুলোর সামনে। একটি একটি করে উলটে দেখতে থাকে। দূর থেকে বাবা-মা দেখছে ছেলের কীর্তি। যেন নিজের নামটি চিনতে পেরেই ঈশান ঘুরে তাকায় বাবার দিকে। বেদের ঈশান, নজরুলের ঈশান যেন সানন্দ গর্বে বলছে, আমি ঈশান বিষাণে ওঙ্কার! ঈশানের হাসি, আনন্দ এই ছবিতে আছে। বাবার হাসিটি ছবির অপর অংশ। সে-অংশ কল্পনার, অনুভবের। নিজেই বুঝে নিন।

০৪

আমার দেশে বছর মানেই সময়ের সুতোয় বাঁধা ছয়টা ঋতুর একটা চক্র

এনকিদু

নববর্ষের উলাস

জুলফিকার কবিরাজ

'৯৮ সালে ১লা বৈশাখের সপ্তা খানেক আগে এক বন্ধু পণ করে বসল এবার যদি ১লা বৈশাখের আগে প্রেম না হয় তাহলে আর টি.এস.সি তেই আসব না। আমি দুষ্টুমি করে বললাম, আমি মন্ত্র জানি। বন্ধু বলল বলেন কি মন্ত্র? বললাম দুই রকম মন্ত্র আছে, এক কুফরি মন্ত্র, দুই সোলেমানি মন্ত্র। কুফরি মন্ত্র তাড়াতাড়ি খ্যালে। সে বলল, কুফরিটাই বলেন। তাহলে শোন, রাতে যগ ডুমুরের শেকড় তুলবে এক নি:শ্বাসে। তারপর শেকড় ভাল করে বেটে বাম হাতের তালুতে নিয়ে ঘুরবে। যাকে পছন্দ হবে তার সামনে গিয়ে ডান হাতের তর্জনি দিয়ে কপালে শেকরের টিপ নিবে , তার পর উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মুখমণ্ডলে কুরু কুরু সাহা, কুরু কুরু সাহা বলে তিন বার ফু দিবে তার পরেই দেখবে সে তোমার পিছে ঘুরঘুর করছে। মন্ত্র সবার খুব পছন্দ হল।

১লা বৈশাখের দিন সকালে শাহবাগে নেমে চারুকলার বৈশাখী র‍্যালীতে অংশ নিয়ে টি.এস.সি তে গেলাম। বন্ধুটি কোন সুন্দরী মেয়ে দেখামাত্র কুরু কুরু সাহা বলে মন্ত্র আওড়াতে লাগল। তার দেখাদেখি বান্ধবীরাও কুরু কুরু সাহা শুরু করে দিল। কিন্তু কারো কপালেই কিছু জুটল না। এর পরে টি.এস.সি তে ঢুকে করিডোরে বসে চেনা-অচেনা সবাই মিলে গান ধরলাম। এক বিদেশী, গলায় তার গিটার ঝুলান। সে বৈশাখের উলাসে মেতে উঠার জন্য আমাদের সাথে যোগ দিয়ে গিটার বাজাতে লাগল। আমরা তাকে তার ভাষায় একটা গান গাইতে বললাম। সে গিটার বাজায়ে নেচে নেচে গান গাইতে লাগল। আমরা তার গানের আগামাথা কিছু বুঝতে না পেরে তার গানের সাথে তাল মিলায়ে শুরু করে দিলাম– ওরে সালেকা ওরে মালেকা ফুলবানু পারলি না বাঁচাতে। বিদেশী আগন্তক তার গান বন্ধ করে দিয়ে হাসতে হাসতে আমাদের সাথে মালেকা সালেকার বাজনা বাজাতে লাগল। এই ভাবে নানান অনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলা নব বর্ষ উয্যাপন করলাম।

মণ্ডা মিঠাই

তানবীরা

ফাল্গুনের মৃদুমন্দ বসন্ত বাতাস এখন আস্তে আস্তে রূপ নিচ্ছে চৈত্রের দাবদাহে। বৈশাখী গরমের ঘন্টা বেজে উঠেছে চার ধারে। শুরু হতে যাচ্ছে আশা-আকাঙ্খা, যুদ্ধ-স্বপ্নের নতুন একটি বছর। কিছু স্বপ্ন বাস্তবে রুপান্তরিত হবে আর কিছু আমাদেরকে হতাশ করে কাঁদিয়ে যাবে। তারপরও আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি দু'হাত বাড়িয়ে নতুনকে বরন করে নেয়ার জন্য। উৎসবের মাদল বাজে চারিধারে। লাল সাদার নতুন শাড়ি, হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি, মাটির গয়না, কাজল মাখা প্রেমমদির চোখ, গান-কবিতার সাথে কিন্তু খাবারের পরিকল্পনাও কম থাকে না। খাবার ছাড়া যেকোন দেশের যেকোন উৎসবই অচল। শুভক্ষনে প্রিয়জনকে মিষ্টিমুখ করানো আমাদের চিরকালের ঐতিহ্য।

আর তা যদি হয় নিজের হাতে তৈরী ....।

সাগরপারের বসন্তদিনে

তুলিরেখা

বসন্তের আনন্দবাজনা বেজে উঠেছে সর্বত্র, আকাশে বাতাসে খুশীয়াল সুর ছড়িয়ে উড়ে যায় পাখিরা। যেসব গাছেরা পাতাহারা রিক্ত বৈরাগী হয়ে দাঁড়িয়েছিলো সারা শীত, তাদের এখন অঙ্গ ঘিরে কিশলয়ের সাজ। পাতায় পাতায় মর্মরিয়ে কথা কয়ে যায় দখিন হাওয়া, কত কী যে কওয়ার আছে তার! নতুন ফুলে ভরে গেছে ঘরের পাশের লম্বা গাছটা, একটা টকটকে লাল পাখি সকাল থেকে সেই গাছে বসে নানা সুরে ডেকে যায়। কি বলে ও?

পিঠের উপরে সোনালী দাগওয়ালা বড় বড় রেশমচকচকে কালো ভ্রমর ফুলের ঝাড়ে আসে, ফুলের ভিতর ঢুকে পড়ে মধুপান করে, ফুলের ঝাড়ের কাছে গেলে শোনা যায় তাদের গভীর সুরেলা গুঞ্জন। তারাও কি কিছু বলে?

মনে পড়ে এই সময়ে আমরা বসন্তোত্সবের জন্য গানের রিহার্সাল দিতাম, "সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে..." লাল গোলাপী কমলা সবুজ আবীর নিয়ে সেই রঙখেলা, সারা সকাল দুপুর ধরে সবাই রঙ মেখে একাকার, শেষ দুপুরে স্নানের সময় ঘষে ঘষে রঙ তোলা, সব রঙ যায় না, থেকে যায় কয়েক দিন... চিনির তৈরী মন্দির মঠ, গোল গোল সাদা বাতাসা, রাঙা বাতাসা, কদমা তিললা, বিকালের মেলায় গিয়ে গরম সদ্যভাজা জিলাপী খাওয়া, নাগরদোলায় চড়া, বেলুন আর বেলুন- রাশি রাশি রঙীন বেলুন, হাওয়ায় উড়ে যেতে চায় সুতার বাঁধন ছেড়ে... কোথায় গেল সেইসব দিন?

পলাশ শিমূল কৃষ্ণচূড়ার লালে দিকদিগন্ত রাঙা এক দিনে কী অপরূপ আলোর রঙের খেলায় আকাশ পৃথিবী ধুয়ে যেতে দেখেছিলাম একবার, বাতাসও যেন গুলাবী নেশায় টলছিলো। কোথায় গেলো সেইসব দিন?

দূর সিন্ধুপারে অচেনা ভূমির উপরে পুষ্পিত আজেলিয়ার তীব্র নেশাধরানো গোলাপী আমাকে মনে করিয়ে দেয়, সেই একই বসন্ত এখানেও। সবই থাকে, কিছুই হারায় না। ভ্রমরজল্পিত আজেলিয়ার পাশে শান্ত হয়ে বসি, তুলে নিই এক অঞ্জলি রঙ, এক অঞ্জলি আনন্দ, রূপসাগরের এক অঞ্জলি জল। ছুঁয়ে থাকি নতুন জীবন। মনে পড়ে আমার দেশে নতুন বছর আসছে নীরব প্রার্থনায় ঠোঁট নড়ে-প্রাণময় হোক আলোময় হোক, আনন্দময় হোক নতুন বছর।

০৪

এই যে পিতা তার শিশুটিকে তুলে ধরেছে সূর্যের পানে
এর চেয়ে সুখের আর কী হতে পারে পৃথিবীতে?

দময়ন্তী

ফুর্তির খোঁজে...

নজরুল ইসলাম

ক্যামেরার পেছনে

সুগঠিত চারদেয়ালের নিরাপদ আড়াল...
প্রসাধনী আর পারফিউমের সুগন্ধ...
মোবাইল ইন্টারনেট আর তাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র...
কোনোকিছুই ঠিক সুখি করে তুলতে পারছেনা
বাথরুমে ঢুকে মুখোশটা খুলে ফেলতেই সব ফকফকা...
আমরা তবু সুখি হতে চেষ্টা করি... কসরত করি
তারপর নিজেকে হারিয়ে আয়নায় খুজিঁ...

ক্যামেরার সামনে

হালায় আমগো কিছুই নাই... ফকিরনির পো আমরা... রাস্তার
ধারে আর ডাস্টবিনের পাশে থাকি ঘুমাই... বস্তিও কপালে
জোটে না... মাইনসে রঙ বেরঙের জামা কাপড় পিইন্দা
গাড়িতে কইরা কাঁচ আটকায়া যায়, আমরা তাগো দেহি আর
হাসি... হালায় বেকুব... বাতাসের মর্ম বোঝে না...
কিছুই নাই, মাগার ফুর্তি আছে... ব্যায়াপক ফুর্তি.. মৌজ আছে...
টোকাইতে গিয়া এইডা খুঁইজ্যা পাইছি... বড়লোকের মুবাইল
ফোনের গান হুনার বিচি... কানে হান্দাইলেই নাকি গান হুনন
যায়... আমগো তো মুবাইল নাই... হুদা বিচিই কানে গুজি...
গান নাই, না থাউক... লারেলাপ্পা ছাড়া কী আছে জীবনে?
আমগো হালায় ফুর্তির অভাব নাই...
দুনিয়াজুড়া পচুর আমোদ... হ...

মার্চ ব্রেক

প্রকৃতিপ্রেমিক

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বাল্যকাল হইতেই শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই'। কথাটা আক্ষরিক ও বাস্তবিক অর্থে আজ একশ বছর পরেও বর্ণে বর্ণে সত্যি। কিছুটা ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার করুণ অবস্থার কথা প্রায়ই পত্রিকায় পড়ি।

ঠিক তার বিপরীত চিত্রই এখানে। শীত প্রায় শেষ হয় হয়, মার্চ ব্রেক চলছে। মার্চের মাঝামাঝি একসপ্তাহ স্কুল বন্ধ। তাই বলে আনন্দ তো থেমে থাকেনা! ডে-কেয়ার সেন্টারগুলো তাই অধিক সরব। সারাদিন আনন্দ, হৈ হৈ, কাগজ কেটে টেডি বেয়ারের পোষাক বানানো থেকে শুরু করে ইতিউতি ঘোরাঘুরি কিছুই বাদ যাচ্ছে না। এত আয়োজন যেন গ্রীষ্ম উৎসবের রিহার্সেল চলছে। শিশুদের নিয়ে ওরা যাচ্ছে পোস্ট অফিসে, দেখাচ্ছে কিভাবে কোথায় পোস্ট করতে হয়, মেইলবক্স কী, স্থানীয় কফিশপে যাচ্ছে, ডোনাট খাচ্ছে, সুইমিংপুলে যেয়ে সাঁতার কাটছে, শপিং মলে গিয়ে ফেস পেইন্ট করছে- সারাদিনমান অফুরন্ত ব্যস্ততা।

দিন যাচ্ছে, ওরা বড় হচ্ছে। আজকের শিশু এখানে আগামীর ভবিষ্যত।

বিঝু ফেগ ডাকে বিঝু বিঝু

বিপ্লব রহমান

চাকমা ভাষায় 'ফেগ' মানে পাখি। বিঝু পাখি আমি কখনো দেখিনি, তবে শুনেছি, ছোট্ট এই রঙিন পাখিটি নাকি বিঝুর সময় অবিকল 'বিঝু বিঝু' করে ডেকে ওঠে। তাই চাকমা লোকগানে গুনবন্দনা করা হয়েছে এই পাখির। তখন নাকি দূর পাহাড়ে পাপড়ি মেলে বিঝু ফুল। ওহ, বলতে ভুলে গেছি, বিঝু হচ্ছে চাকমাদের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান- এই তিন জেলা নিয়ে গড়ে ওঠা পার্বত্য চট্রগ্রাম তাই যেনো নতুন করে সাজে প্রতিবছর বিঝুর আনন্দে। বাংলা মাসের চৈত্র সংক্রান্তি শেষ দুদিন ও পহেলা নববর্ষের দিন-এই তিনদিন ধরে চলে বিঝু উৎসব। বিঝু উৎসবকে ঘিরে পুরনো বছরকে বিদায় আর নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পাহাড়ে পাহাড়ে চলে নানা আয়োজন। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মালম্বি হলেও উৎসব, বিয়ে, নতুন বাড়ি করা বা জুমের (পাহাড়ের ঢালে বিশেষ ধরণের চাষাবাদ) ফসল তোলার ক্ষেত্রে আদিধর্ম 'প্রকৃতি পূজার' এখনো বেশ কিছু বিষয়-আশয় তারা বংশপরম্পরায় পালন করেন। তাই ফুল বিঝু, মূল বিঝু ও গইজ্জা-পইজ্জা বিঝু- এই তিনদিনের বিঝু উৎসবে আদিধর্মের বেশ কিছু রীতি এখনো পালন করা হয়। ফুল বিঝু হচ্ছে, বিঝুর প্রথম দিন। এদিন বাড়ির সকলে নতুন জামা-কাপড় পরেন। বাড়ি-ঘরগুলোকে আগে থেকেই ধুয়ে-মুছে ফুল ও লতাপাতা দিয়ে সাজানো হয়। আর শিশু-কিশোররা খুব ভোরে পাহাড়ি ছোট নদী বা ছড়ায় গিয়ে স্নান সেরে নেয়। তারপর পানির দেবতার উদ্দেশ্যে কলাপাতায় আতপচাল, ফল-মুল, চিনি বা গুড়, ফুল-ইত্যাদি

নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা দেওয়া হয়। এরপর বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে পূজা-অর্চণা চলে। ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা এ বাড়ি-সে বাড়ি ঘুরে বড়দের আশির্বাদ নেয়। বৌদ্ধ পুরোহিত বা ভান্তেরা এ দিন পাবেন নতুন গেরুয়া বস্ত্র। পরদিন মূল বিঝুতে চলে এ পাড়া সে পাড়া ঘুরে নানান ধরণের পাহাড়ি খাবার, পিঠে আর মদ খাওয়া। বিঝু উৎসবের আন্যতম আকর্ষণ 'পাজন' নামে একধরণের তরকারি। কমপক্ষে ২০ ধরণের আইটেম দিয়ে বানানো হয় এই খাবার। বুনো আলু, হাঙরের শুটকি, কাঁচাকাঠাল, কচি বেত ও বাঁশের ডগাসহ অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন তরিতরকারি, 'সিঁদোল' নামে একধরণের শুটকি মাছের পেস্ট মিলিয়ে রান্না করা হয় সুস্বাদু পাজন। যে বাড়িতে সবচেয়ে বেশি পদের খাবার দিয়ে পাজান বানানো হয়, সে বাড়ির সুনাম বাড়ে বিঝুর সময়। আর ভাত থেকে এ সময় বানানো হয় দু'ধরণের মদ। একটি হচ্ছে দো-চোয়ানি, আর একটি হচ্ছে ভাত পঁচিয়ে বানানো ভাতের রস-জগরা বা কাঞ্জি। দো-চোয়ানির রঙ একেবারে পানির মতো স্বচ্ছ। এটি ভাত পঁচিয়ে তার রস ডিস্টিল করে বানানো হয়। দুবার ডিস্টিল বা চোয়ানো হয় বলে এর এমন নামকরণ। খুবই কড়া ধরণের মদ। তবে জগরা অতোটা কড়া নয়। এটি দেখতে সাদা রঙের, খেতে একটু টক টক, মিষ্টি মিষ্টি। এতে অ্যালকোহলের পরিমান থাকে খুবই কম। আমার চাকমা বন্ধুরা জগরাকে দুষ্টুমি করে বলেন চাকমা বিয়ার! বিঝুর দিনগুলোতে ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ির মদ খেতে কোনো বাধা নেই। তবে মদ খেয়ে মাতলামি করা চাকমা সমাজে গর্হিত অপরাধ। আর মদ খাবার জন্য সিনিয়র-জুনিয়ররা আলাদা আলাদা আসর বসায়। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলে পানাহার।

বাংলা নববর্ষের দিন হচ্ছে বিঝুর শেষ দিন, গইজ্জা-পইজ্জা বিঝু। চাকমা ভাষায়, গইজ্জা-পইজ্জা কথার অর্থ হচ্ছে গড়াগড়ি। এর আগের দুদিন উৎসবের ধকল সেরে সবাই নিজ নিজ বাড়িতে আয়েশ করা গড়িগড়ি দিয়ে বিশ্রাম নেবেন, তাই বুঝি এমন নামকরণ।

আমি শুনেছি, পাঁচ-ছয় দশক আগেও বিঝুর দিনগুলোতে গ্রামের বড় বড় গাছে দোলনা বাঁধা হতো ছেলে-মেয়েদের খেলার জন্য। 'গিলা' খেলা, লাটিম খেলা, তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওঠার প্রতিযোগিতা, ঘুড়ি ও ফানুস ওড়ানো, গেংগুলি গীত, যাত্রার পালা- এসব ছিলো প্রায় ধূসর হওয়া বিঝুর অন্যতম আকর্ষন।

কিন্তু শান্তিবাহিনী-সেনাবাহিনীর আড়াই দশকের বন্দুক যুদ্ধ, অসংখ্য গণহত্যা, গণধর্ষণ, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ৭০ হাজার আদিবাসী পাহাড়িকে ভারতের ত্রিপুরায় একযুগের বেশি সময় ধরে গানিময় শরণার্থির জীবন বেছে নিতে বাধ্য করা- এমনই অস্থির-অশান্ত সময়ে হারিয়ে গেছে বিঝুর সেই রঙিন উৎসব। আর টেপ/সিডি রেকর্ডার কিংবা মোবাইলের রিংটোনের শব্দে বুঝি চুপ করে গেছেন 'গেংগুলি গীতের' বুড়ো শিল্পী, তার 'রাধমন ধনপুদি' পালাগানের খাতা, প্রিয় পুরনো বেহালা তো খোয়া গেছে সেই কবেই!

ফুল বিঝু, চেংগি ছড়া, খাগড়াছড়ি, ২০০৫

রঙ-'বে'রঙের নববর্ষ

মাশীদ

ফুর্তি বা রঙের ছবি খুঁজছি বেশ কিছুদিন ধরে। খুব আনন্দময় কিছু। হার্ড ডিস্কের 'My Pics' ফোল্ডারের প্রায় সব সাবফোল্ডার খোঁজা শেষ। ব্যাপার কী? কোন ফুর্তি কি করিনি এই শেষ ক'বছর? ছবি পাচ্ছি না কেন? ঘুরেফিরে দেশে কাটানো শেষ পহেলা বৈশাখের ফোল্ডারেই ফিরে গেলাম আবার। ১৪১৪-তে দেশে ফিরে গিয়েছিলাম ইচ্ছে করেই ঠিক পহেলা বৈশাখের আগের দিন। এর আগে আরো দু'টো বৈশাখ এসে চলে গেছে আমাকে ছাড়াই। আরো একটা এসে চলে যাবে? হতেই পারে না! ঢাকায় পৌঁছাতেই বড়বোন নিয়ে গেল শাড়ির দোকানে। ১৪১৪-এর প্রথমদিনে তাই আমার বড়বোন আর মা'র সাথে নতুন শাড়ি পরে রমনাতে যাওয়া মিস হল না।

কিন্তু এরপর আরো একটা বৈশাখ এসে চলে গেল। আরেকটা প্রায় এসে পড়ল। এককালে সারা বছর ধরে যেই দিনটার জন্য অপেক্ষা করতাম, যেই দিনটা এককালে ছিল মাল্টিকালার্ড, সেই দিনটা এখন এসে চলে যায় কোন রঙ বা ফূর্তি ছাড়া। কোন এক রুক্ষ বদ্ধ ঘরে সারা দিন কাটাই জীবনের অন্য কোন চাহিদায়, রঙহীন। শুধু দু'মিনিট সময় পেলে একটু ভেবে নেই এভাবে আরো কতকিছু থেকেই না দূরে সরে গেছি... and at the end, is it all worth it?

যাই হোক, পহেলা বৈশাখ এখন শুধু দুঃখই বাড়ায়। আর পিছনে টেনে ধরে। ছবিটা সেই শেষ ১৪১৪-এর প্রথম দিনের সকালে তোলা। এই অচেনা গামছা গ্রুপের কে কোথায় এখন কে জানে! আশা করি এই বৈশাখের প্রভাতে ওরা বা অন্য কেউ একই উচ্ছলতায় ধরে রাখবে বৈশাখের প্রাণ আর রঙ। আমার মত সবাই যেন রঙ থেকে ছিটকে পড়ে বৈশাখকে রঙহীন করে না দেয়। সেই দিন যেন কোনদিন না আসে।

শুভ নববর্ষ।

০৪

নূতনের জয়ধ্বনি

মৃদুল আহমেদ

ঐ নূতনের কেতন ওড়ে
কালবোশেখীর ঝড়...
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

ঐ যে! সূর্য উঠেছে। পাখি ডাকছে। সবুজ পাতায় টলমল করছে আলো। যেন সোনালী মধু এই এসে পড়ল করতলে! ঐ যে সুর বাজছে! ঐ যে লক্ষ মানুষের পায়ের আওয়াজ... ওরা হেঁটে চলেছে সে কোন অমৃতের দিকে? বড় সুন্দর এই পৃথিবী! জয় হোক!

আমার বর্ষবরণ

মৃন্ময় আহমেদ

নবজীবন এভাবেই আসে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে
নববর্ষ, নব্যরূপে
ক'দিন আগে তো শুভ্র তুষার ছিলো,
এখন মৃদু হিমেল বাতাস।
শুকনো ডালপালা ছিলো পিচ গাছটার সম্বল,
আর আজ নতুন কুঁড়ি।
আবার বাঁচতে শেখা-
সবুজ নিয়ে খেলা আর ফুলে ভ্রমরের আনাগোনা।
নীল আকাশ, মধ্যমনি সূর্য সব্বাই উদ্ভাসিত, আলোড়ন মনন মরমে-
ইট-সিমেন্টের বাড়িটাও উঁকি দেয়, বৃক্ষাদির আনন্দ ছুঁয়ে যায় সর্বত্র।
বৈশেখ, জানুয়ারি টানে না
এ আমার বর্ষবরণ, দিন তারিখের বালাই নেই।
সময়ের সাথে পথচলা,
আমৃত্যু সৃষ্টির মহান সৃষ্টি 'জীবন' নিয়ে বেঁচে থাকা
বিধাতার অপরূপ নিসর্গ নব্য নব্য রূপে আমায় দেয় অনবদ্য উপহার।

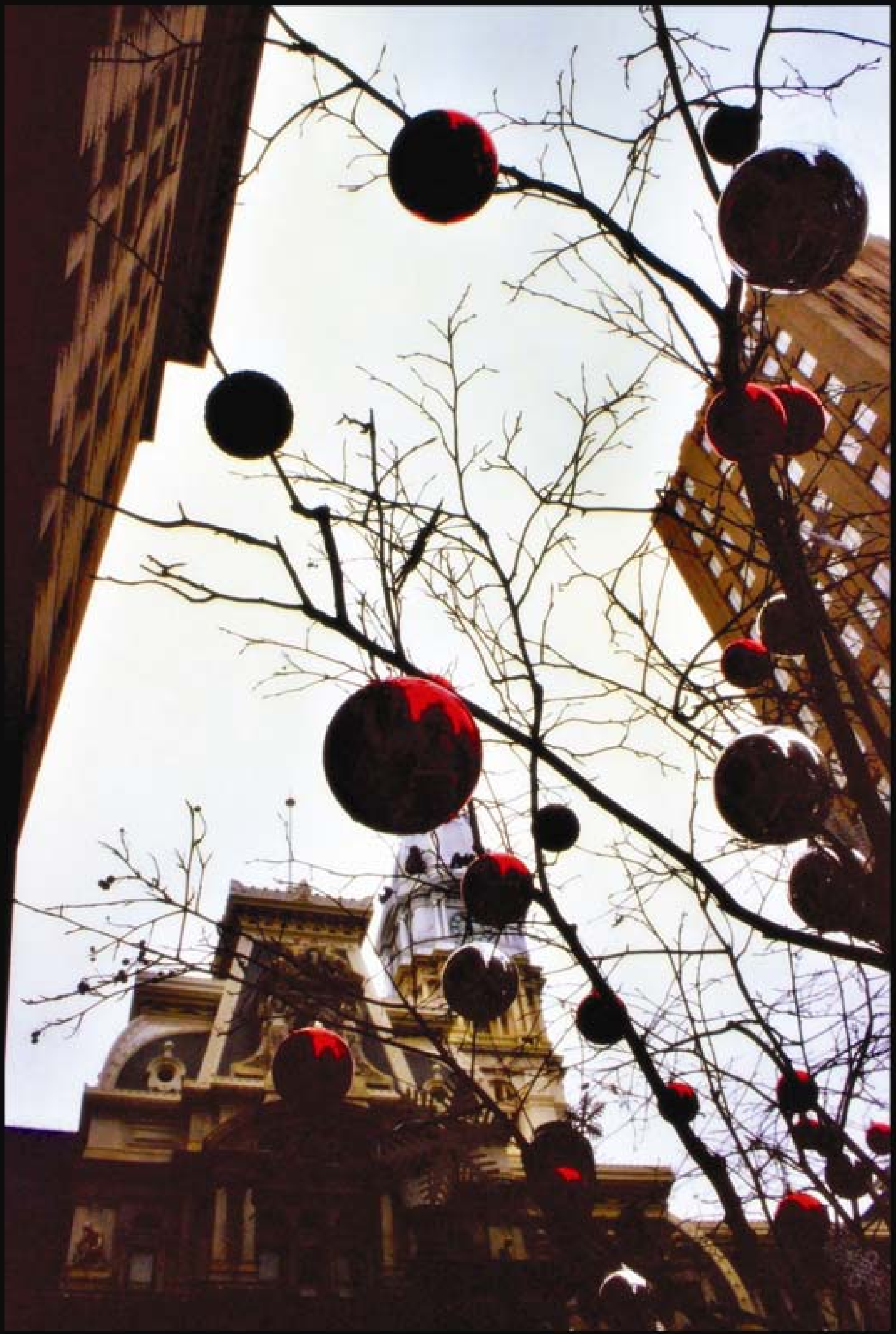

দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা

মূলত পাঠক

ডিসেম্বর প্রায় শেষ, যিশু অলরেডি চলে এসেছেন, নতুন বছর এল বলে। ফিলাডেলফিয়ার রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন হেঁটে বেড়াচ্ছি, এক বন্ধুর ছুটি হওয়ার প্রতীক্ষায়, সে বেরোলে একসাথে রওনা হবো। হাড় কাঁপানো ঠান্ডা, কিন্তু তার মধ্যেও পথেঘাটে লোকের অভাব নেই। সবার মনে ফুর্তির রঙ লেগেছে, অতএব প্রাণভরে শপিং করে বেড়াচ্ছে। নতুন বছর বলে কথা, বচ্ছরকার মেগা ইভেন্ট। যদিও সেভাবে দেখলে নববর্ষ ব্যাপারটা কিছু বিশেষ ঘটনা নয়। মহাকালের গ্র্যান্ডফাদার ক্লকে হয়তো একটা পল-অণুপল কেটে গেলো, আর আমরা এই নশ্বর মানুষেরা সেই আনন্দে ডিগবাজি মদ-টদ এমনকি মাঝরাত্তিরে চুমুও খেলাম একচোট। আমাদের বালখিল্যপনা দেখে ওপরতলার ভদ্রলোক (যদি সত্যি কেউ থাকেন) খ্যাক খ্যাক করে হাসেন নির্ঘাত। যাক, তো সেই ফিলির রাস্তায় ফেরা যাক। ভয়ানক শীতের চোটে কালো-কালো জোব্বা-আলখালা-ওভারকোট সবার অঙ্গে চেপেছে ঠিকই, কিন্তু রসিকজনতা তার মধ্যেই রঙচঙে স্কার্ফ টুপি এঁটে জানাতে ভুলছে না যে মোচ্ছবের মরশুম চলছে পুরোদমে। মুখ খুললেই ভক ভক করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, তা বলে বত্রিশ পাটি না দেখালে চলবে? প্রকৃতিদেবী কিন্তু দয়া করতে নারাজ। তুষারপাত হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু রাস্তার ধারে ধারে জমে থাকা নোংরা বরফ গলার নাম নেই। আকাশ ঘোলাটে মেরে আছে, উৎসবের দিনে সেটা যে ঘোর বেমানান সে হুঁশ নেই। গাছটাছ সব কঙ্কালসার, সবুজের চিহ্ন নেই। ক্যামেরাটা বেকার আনলাম ভাবছিলাম যখন, তখন দেখলাম এই গাছটাকে। মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু স্বার্থপর দৈত্যের গল্পের মতো উৎসবের আনন্দের রঙে ঢেকে গেছে শীতের ঔদাসীন্য। শুভ নববর্ষ।

“আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম...”

মুস্তাফিজ

উৎসব নিয়ে লেখার শুরুতেই এই গানের লাইনটাই প্রথমে মনে এসেছে। ছোটবেলায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকতাম কখন স্কুল ছুটি হবে তা সেই ঈদ, নববর্ষ কিংবা পূজোই হোক। ছুটি যদি হতো দিন দুয়ের বেশী তাহলে অবধারিতভাবে ধরে নিতাম দাদাবাড়ী যাচ্ছি। ছোটবেলায় উৎসবের প্রধান মজাটা ছিল এই বেড়ানোতেই, আর ছিলো ঈদে নতুন কাপড় পড়ে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ। আজ এই বয়সে এসে ছোটবেলার সেই আনন্দকে দেখতে পাই নিজের আর ভাইদের ছেলেমেয়েদের করা আনন্দের মাঝে। আমাদের কাছে উৎসবের নানান প্রকারভেদ যেমন ধর্মীয়, সামাজিক, আঞ্চলিক বা গোষ্ঠীগত যাই হোক না কেন বাচ্চাদের কাছে এসবের কোন মূল্যনেই। তাদের কাছে উৎসবের মূল্যমান নির্ধারন হয় তাতে স্ফুর্তির মাত্রা কতটুকু তা দিয়ে। একবার আমার বড়ভাই ঈদে ঢাকায় থাকার সিদ্ধান্ত জানালে তাঁর বড় ছেলে বলেছিলো “ঢাকায় কি ঈদ হয়? ঈদ হয় দাদা বাড়ীতে”। আমরা আট ভাই। বড়সর কোন ছুটি পেলে সবাই চেষ্টা করি গ্রামের বাড়ীতে যেতে, একদিন বা দুইদিন যে কতদিনই থাকি না কেন বাচ্চাদের আনন্দের কমতি থাকে না, সেই সাথে আমাদেরও। সাথের ছবিটা কি সেটাই প্রমাণ করে না?

আবহমান...

রণদীপম বসু

খোদ মহানগরীতে রাস্তার পাশে বটগাছ! খুব একটা চোখে পড়ে না। তবু অযত্নে অবহেলায় বেড়ে ওঠা এরকম একটা অল্পবয়েসী গাছের গোড়ায় মাটি ফেলে কারা যেন অতি যত্ন করে ইঁট সিমেন্টের একটা গোলাকার বেদী বানিয়ে রেখেছে। অতএব পাশে একটা টং-দোকান তো নিশ্চিৎ! চা পান সিগারেট। আর হাল আমলের মোবাইল সংস্কৃতির সলতে ধরে ফ্লেক্সিলোডের চেয়ার টেবিল পেতে বসাটাই তো স্বাভাবিক। বেশ একটা জমজমাট অবস্থা, বিশেষ করে দুপুরের দিকে। খররৌদ্রের দাবদাহে পুড়ে ঘর্মাক্ত কপালটা গলার গামছায় মুহূর্তে মুছতে জিরিয়ে নেয়া রিক্সাচালকটির মতো গাড়িঅলা সাহেবের অপেক্ষারত ড্রাইভার কিংবা লাঞ্চবিরতির ফাঁকে দু'টান সিগারেটের ধোঁয়ায় একটু আরাম খোঁজেন চাকুরে বাবুটিও। শ্রেণীপেশার ভেদাভেদ ভুলে বহুবিচিত্র কর্মজীবী মানুষগুলোর এই দু'দণ্ড জিরিয়ে নেয়ার ফাঁকে কোত্থেকে হাজির হলো বাউলগোছের লোকটি। কাঁধে ঝোলানো দোতারাটার দিকে চেয়ে উৎসাহী কারো অনুরোধ তুঙ্গে পৌঁছতেই ব্যাস, জমে ওঠলো মেলা!

আবহমান বাঙালির বুকের ভেতরে পোষা চিরায়ত স্রোত মুহূর্তেই ছলকে ওঠে দোতারার টান আর বাউলের সহজিয়া সুরে। ভেঙে যায় সব বাধ। খঞ্জনি হাতে কেউ একজন দাঁড়িয়েও গেলো। বাউলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উদাত্ত হয়ে ওঠলো সেও। না থাক সুর, তাতে কী! প্রাণের প্রাচুর্য তো আছে! টং-দোকানের ফিল্টার পানির শূন্য কন্টেইনারটাই টেনে নিলো আরেকজন। শিল্পী হয়ে ওঠা শ্রমজীবী হাতের ঠুকঠাক তালে সত্যি সত্যি আসরটাই গরম হয়ে ওঠলো এবার। উৎসাহী পথচারীদের বুকেও একে একে ছড়িয়ে গেলো গ্রাম বাংলার লোকায়ত সুরের সেই চিরচেনা আহ্বান, নগরীর ইঁট-কাঠ-রড-সিমেন্টের তলায় চাপা পড়েও যা হারিয়ে যায়নি, হারায় না-

কই যাওরে বন্ধু তুমি আমারে ছাড়িয়া
তুমি ছাড়া জীবন যৌবন রাখি কার লাগিয়া
বন্ধু কইয়া যাও কইয়া যাওরে...।।

বৈশাখী মেলার রঙীন খেলনাগুলো

লীনা ফেরদৌস

পহেলা বৈশাখ, শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কাঠেরপুল পার হয়ে শত শত মানুষের সহযাত্রী হয়ে ধুপখোলার মাঠের মেলা দেখতে যাওয়া। ছোটবেলায় পহেলা বৈশাখে বাবার সাথে ধুপখোলার মাঠে যেতাম। সেখানে বিরাট বৈশাখী মেলা বসত। আমি ভাই বোনের মধ্যে বড় ছিলাম। বাবা আমাকে মেলায় নিয়ে যেতেন। আমার ছোট ভাইকে মা যেতে দিতেন না, হয়ত ভয় পেতেন, বাবা যদি দুজনকে সামলাতে না পারেন, ও যদি হারিয়ে যায়? ভাইয়ের যত আবদার ছিল আমার কাছে। ও জানতো বাবাকে বলে লাভ নেই, মনে রাখতে পারবেন না, তাই মেলা থেকে কি কি আনতে হবে সেটা আমাকে বলে দিত। এই দিনটাতে বাবা দরাজদিল থাকতেন। কত রকম খেলনা তা বলে শেষ করা যাবেনা। মাটির পুতুল, টিয়া পাখি, ছোট ছোট হাঁড়ি পাতিল, বেলন পিড়া, বাঁশী, বেলুন, ডুগডুগি, ঢোল ইতাদী। সবচেয়ে মজার ছিল মাটির ব্যাংক। আম, কাঁঠাল, তাল, বাংগি এসব ফলের মতো ছিলো মাটির ব্যাংকগুলি। আমরা সারা বছর ওখানে পয়সা জমাতাম। ভাঙ্গতাম মেলায় যাওয়ার আগে, যেন ইচ্ছেমত নিজে কিছু কিনতে পারি। কচি প্রাণে একদিনের সেই মেলার আনন্দ সারা বছর আনন্দের দোলনায় দোলাত। আহা কি যে সুন্দর বিভিন্ন রঙ্গের বর্ণিল খেলনা ছিল- সেই রঙীন খেলনাগুলি আমাকে অনেক স্বপ্ন দেখাত, এক রূপকথার দেশে নিয়ে যেত। আমার বিদেশী দামী খেলনাও ছিল। কিন্ত কেন জানিনা মেলার সেই পুতুল, টিয়া পাখি, হাঁড়ি পাতিল আমাকে ভীষণভাবে টানত। একবার মনে আছে কাঠের পুল পর্যন্ত আসার পর শুনলাম পুলটা ভেঙ্গে গেছে। আমি বাবার হাতটা জোরে ধরে বাবার দিকে তাকালাম, "এখন কি হবে যদি পুল পার না হতে পারি, তবে তো মেলায় যাওয়া হবে না। না গেলে সারা বছর তবে কী নিয়ে খেলব?" বাবার চোখে হাসি ছিল, তিনি আমার হাতটি শক্ত করে ধরে অনেকটা পথ ঘুরে লোহার পুলের উপর দিয়ে মেলায় নিয়ে গেলেন। মেলায় যাওয়ার আগের দিন উত্তেজনায় ঘুম হতো না আবার খেলনা কিনে আনার পর আনন ঘুম হত না। খেলনাগুলো বিছানায় নিয়ে ঘুমাতাম, সারারাত হাতে ধরা থাকত। মা দেখলে রাগ করবেন তাই গায়ের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখতাম। সেই অল্প দামী মাটির খেলনা গুলো দিয়ে এক রঙীন স্বপ্নের জগৎ সাজাতাম। জীবনের এতটা পথ পার হয়ে এলাম, কত উৎসব, আনন্দ কত কি না দেখলাম, কিন্ত কেন যেন সেই ধুপখোলার মেলার আনন্দ আমার মনে আজো বৈশাখী মেলা হয়ে হৃদয় জুড়ে বসে আছে। জানি না আজও ধুপখোলার মাঠে সেই মেলা বসে কিনা, সেই মাটির পুতুল, টিয়া পাখি, হাড়ি পাতিল পাওয়া যায় কিনা, যদি কখনো যাই, পারবো কি সেই আগের আনন্দ আর উত্তেজনা অনুভব করতে? মনটা ভীষণ উদাস হয়ে যায় যখন এই গানটি শুনি 'আমি মেলা থেকে তাল পাতার এক বাঁশী কিনে এনেছি, বাঁশী তো আগের মত বাজে না, মন আমার তেমন যেন সাজে না, তবে কি ছেলেবেলা অনেক দূরে ফেলে এসেছি...।

তুষারস্নাত বৈশাখ

সচল জাহিদ

এখানে নেই রমনার বটমূল, নেই ছায়ানটের বৈশাখী আসর কিংবা পান্তা ইলিশের বাহার, গ্রাম বাংলার সেই বৈশাখী মেলাও নেই, শুধু আছে কিছু অন্তঃসারশুন্য মানুষ যাদের শরীর এইখানে কিন্তু হৃদয় পড়ে আছে হাজার হাজার মাইল দূরে কোন এক দেশে যেখানে গ্রীষ্মের গরম বাতাস কিংবা কালবৈশাখীর মত ঝাপ্টা তার আগমনী গান শুনিয়ে নিয়ে আসছে নতুন বছর। ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে পহেলা বৈশাখের সকালে বাজারে হালখাতা খেতে যাওয়া কিংবা বায়না ধরে বৈশাখী মেলায় টমটম গাড়ি, চিনিসাজ, বিন্নি ধানের খৈ নিয়ে বাড়ি ফেরার আনন্দ পাইনা কতদিন। দাদুবাড়িতে ঝড়ের রাতে মায়ের বকুনি উপেক্ষা করে আম কুড়াতে যাওয়া হয়না অনেকদিন। স্কুল জীবনের সেই দিনগুলির মত বন্ধুদের বাসায় নাড়ু, মোয়া খেতে যাওয়া হয়না, খেলাঘরের বৈশাখী উৎসবের আয়োজনেও থাকা হয়না সেই কবে থেকে। তৃষ্ণার্ত হৃদয় তাই বার বার ফিরে যেতে চায় বাংলাদেশে যেখানে সূর্যোদয়ের ক্ষনে নতুন রঙে সেজে 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' গানে মুখরিত হয় বাংলার সকাল। এখানে বাংলা মা নেই, নেই তার রঙীন জমিনের শাড়ী কিন্তু তারপরেও নতুন বছরকে বরণ করে নিতে বড় সাধ হয় তাই বুক চিড়ে খুঁজে বের করি এক টুকরো রবিঠাকুরকে যাকে অহর্নিশ লালন করে চলেছি। আর তাই কাগজ কেটে বৈশাখী মঞ্চ সাজাই, আল্পনা আঁকি, দেশ থেকে আসার সময় নিয়ে আসা নকশী কাঁথা দিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি গ্রাম বাংলার সেই চিরায়ত সংস্কৃতিকে। নিজেরা বৈশাখী সাজে সাজি, সাজাবার চেষ্টা করি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও। ওরা বিরক্ত হয়, ভ্রু কুঁচকে পাজামা পাঞ্জাবী পরিহিত নিজেকে আয়নায় দেখে, রোমান হরফে লিখে দেয়া বাংলায় 'এসো হে বৈশাখ' গানটি যে আবেগ নিয়ে আমরা গাই ঠিক সেই পরিমান বিরক্ত নিয়ে ওরাও গাইবার চেষ্টা করে। তবুও এই শ্বেত যবনের পূরী এডমন্টনে নতুন বাংলা বছর আসে আর আমরা তাকে বরন করে নেই হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা দিয়ে। সম্মিলিত কণ্ঠের বৈশাখী গান সারা বছরের আবর্জনার মতই বাইরের তুষারকে ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়, আর সেই তুষারস্নাত বৈশাখ আমাদেরকে নিয়ে যায় মায়ের কোলে যেখানে শুয়ে রাজ্যের ঘুম আসে দু'চোখে।

সবাইকে ধন্যবাদ